সরকারের হাত লম্বা...

যে ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকা উচিৎ সেখানেই সরকার নিষ্ক্রিয়। আর যেখানে প্রয়োজন নীরব থাকা সেখানে সরকার সরব, খুবই মুখর। সন্ত্রাসী না ধরে ধরছে বিরোধী দলের ত্যাগী নেতা কর্মীদের। দুর্নীতিবাজ সাংসদকে বকা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন প্রধানমন্ত্রী। দাতা সংস্থাগুলো একের পর এক প্রকল্প অনুদান বন্ধ করছে। তারপরও সরকার থামছে না। আদালতও বলেছে, 'জানি, সরকারের হাত লম্বা...' এই লম্বা হাত বিএনপি, গণতন্ত্রের জন্য কতটা মঙ্গলজনক... লিখেছেন গোলাম মোর্তোজা

কাক-কোকিল বন্ধুত্ব হলো না, শত্রুই রয়ে গেল। যদিও কোকিল প্রজাতি কাকের ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে। প্রয়োজনের সময় কোকিল আশ্রয় খুঁজতে যায় কাকের বাসায়। তারপর কোকিল আর কাককে মনে রাখে না। কোকিল চতুর আর কাক বোকা– ইতিহাস চিহ্নিত করে এভাবেই। আমাদের রাজনীতিবিদরা কোকিল আর জনগণ কাক। চতুর রাজনীতিবিদরা সারা জীবন চালাকি করেই গেল। বোকা জনগণ ঠকেই গেল সারা জীবন। তারা রাজনীতিবিদদের কথায় বিভ্রান্ত হয়, স্বপ্ন দেখে, ভোট দেয় বারবার। কাক-কোকিলের যে কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না, জনগণ আজও বুঝলো না। বুঝলো না বলেই তার জীবনে কোনো পরিবর্তন এলো না। আর এর সুযোগ নিয়ে কোকিলরূপী রাজনীতিবিদরা তাদের প্রসার বাড়িয়েই চললো।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠিয়েছিল বিএনপিকে। '৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত তারা রাজত্ব করেছে। শেষ কয়েক মাস ছাড়া খুব যে খারাপ করেছে, বলা যাবে না। '৯৬-এর নির্বাচনে জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল আওয়ামী লীগ। তারাও শেষ কয়েক মাস ছাড়া পুরো সময়টা খুব খারাপ চালায়নি। যদিও সন্ত্রাসসহ নানাবিধ সমস্যা ছিলো আওয়ামী লীগের পুরো সময়কাল। সন্ত্রাসসহ নানা সমস্যা ছিলো বিএনপির সময়কালেও। তবে '৯৬-এর আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সবচেয়ে যে বিষয়টি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, সেটা হলো ভিআইপি সন্ত্রাস। যা '৯১-এর বিএনপি সরকারের সময়ে দেখা যায়নি। এই দুটি সময়কাল নিয়ে দেশের মানুষ আশাবাদী হয়েছিল গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির কথা ভেবে। মানুষ ভেবেছিল এভাবে যদি জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার ধারা তৈরি হয়, তাহলে একটু হলেও রাজনীতিবিদদের ভাবনায় পরিবর্তন আসবে। জনগণের এই ভাবনাটি সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিলো ২০০১ সালের নির্বাচনে। আওয়ামী ভিআইপি সন্ত্রাসী শাসনের ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত মানুষ ভোট দিলো চারদলীয় জোট তথা বিএনপিকে। বিস্ময়কর রকমের সাফল্য নিয়ে ক্ষমতায় এলো বিএনপি। এবারের বিএনপি সরকারের ওপর জনগণের ছিলো বিশাল প্রত্যাশা। মানুষ আশাবাদী ছিলো

সরকার নিশ্চয় তাদের সেই প্রত্যাশার মূল্য দেবে। এমনটা ভাবার যুক্তিও ছিলো। কারণ মানুষ ভেবেছিলো '৯১-এর অভিজ্ঞতা ২০০১-এ কাজে লাগাবে বিএনপি। পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে কী কারণে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে সেটাও তারা ভুলে যাবে না।

কিন্তু ক্ষমতা তো ভিন্ন জিনিস। ক্ষমতাসীন হলে রাজনীতিবিদরা সবচেয়ে আগে ভুলে যায় জনগণের কথা। বিএনপি ক্ষমতায় গিয়েই সেটা প্রমাণ করেছে। অন্তত এখনো পর্যন্ত তাদের কাজকর্মে কাক- কোকিল তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে না। এক ভয়ঙ্কর রোগের নাম ক্ষমতা। ক্ষমতা মানুষকে অহঙ্কারী করে তোলে। পূর্বের সব কিছু ভুলে যায়। ক্ষমতা যে সাময়িক সেটাও ভুলে যায়। এমনটা ঘটে আমাদের রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে। আবার ভিন্ন চিত্রও আছে। ক্ষমতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে করেছিল আরো বিনয়ী, আরো মানবতাবাদী। আসলে এই সব কিছুর মূলে কাজ করে সততা, জনগণ এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। আমাদের রাজনীতিবিদদের যেহেতু এর কোনোটাই নেই তাই তারা হয়ে যায় অহঙ্কারী, অসৎ। ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করে অসততার সিঁড়ি হিসেবে। ক্ষমতায় গিয়েই আগের ব্যর্থতাগুলোকে সফল হিসেবে ভাবতে থাকে, এক পর্যায়ে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে। যখন থেকে বিশ্বাস করা শুরু করে তখনই ক্ষমতাসীনরা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। কোনো হিসাবই তখন আর তারা সহজে বুঝতে চায় না। সব কিছুর মধ্যেই অন্য গন্ধ খোঁজে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ-মন্ত্রীদের হাত লম্বা হতে থাকে। যে হাত যেখানে যাওয়ার কথা নয় সেখানে চলে যায়। হাইকোর্টের ভাষায়, '... সরকারের হাত অনেক লম্বা...।' মজার ব্যাপার হলো, এই হাত একবার লম্বা হয়ে গেলে ক্ষমতায় থাকাকালীন আর স্বাভাবিক করা যায় না। কিন্তু ক্ষমতা থেকে পতনের সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হাত আপনা আপনিই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে সেটা সাময়িক সময়ের জন্যে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের হাত অল্প সময়ে খুব বেশি লম্বা হয়ে গেছে। এ কারণে এহেন জায়গা নেই যেখানে সরকারের হাত চলছে না। সরকারের হাত চালানোর কারণেই বন্ধ হয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট। এই বন্ধ বিদ্যাপীঠ দেখলে মনে হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইন আর পিলখানার সম্প্রসারিত অংশ। ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে বিতাড়িত করেছে সরকারের পুলিশ। ছাত্রছাত্রীরা আশ্রয় নিল শহীদ মিনারে। সেখানেও তাদের থাকতে দেয়া হলো না। ক্যাম্পাসের মতো শহীদ মিনারও এখন অবরুদ্ধ। ছাত্রছাত্রী-সংস্কৃতি কর্মী সবার জন্যেই শহীদ মিনার এখন নিষিদ্ধ পল্লী। সরকার বলছে শহীদ মিনারে সমাবেশ করা যাবে না। বর্তমান সরকারের ভাবটা এমন যেন তারা সারা জীবনের জন্যে ক্ষমতায় এসেছে। তাদের বিরুদ্ধ মতের কারো কথা বলার অধিকার থাকবে না, সমাবেশের তো নয়ই। সরকার বা কারোরই সব জায়গায় হাত দেয়া উচিত নয়, সম্ভবও নয়। এই অনুচিত এবং অসম্ভব কাজটিই ক্ষমতাসীনরা সব সময় করে। বর্তমান সরকারও করছে। কিন্তু যে কাজ করার কথা যে সময়ে করার কথা সেটা আবার করছে না, করতে পারছে না। ছাত্রী হলে পুলিশি নির্যাতনের অনুমতিদানকারী ভিসি প্রক্টোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দীর্ঘ সময় নিয়ে বিপদে পড়েছে সরকার। আর এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় হিসেবে পুলিশ, বিডিআর দিয়ে পেটানো হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। বলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা শহীদ মিনারে সমাবেশ করবে কেন? কিন্তু এই প্রশ্নের আগে কী এই প্রশ্নটি আসা উচিত নয়, ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে যেতে দিচ্ছেন না কেন? ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে সমাবেশ করতে দিচ্ছেন না কেন? বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি আছে। তাদের দাবির প্রতি সমাজের একটি অংশের মানুষ সংহতি প্রকাশ করেছে। তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নিলাম ছাত্রছাত্রীদের দাবি এবং সংহতি প্রকাশ কোনোটাই যৌক্তিক নয়। তারপরও কী সমাবেশ করা যাবে না? মাননীয় জোট সরকার গণতন্ত্র কাকে বলে? মুখে গণতন্ত্রের কথা বলবেন, জনগণের ভোট নেবেন আর তাদের কোনো কথা বলতে দেবেন না— এর নাম কী গণতন্ত্র? ভোট দিয়ে ভুল করেছি- জনগণকে এরকম ভাবতে বাধ্য করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মনে রাখতে হবে, জনগণ আগামী নির্বাচনে আপনাদের ভোট দিতে বাধ্য না। পুলিশ, বিডিআর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেটানো যাবে; শহীদ মিনার, ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রাখা যাবে- ভোট পাওয়া যাবে না।

ক্ষমতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে করেছিল আরো বিনয়ী, আরো মানবতাবাদী। আসলে এই সব কিছুর মূলে কাজ করে সততা, জনগণ এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। আমাদের রাজনীতিবিদদের যেহেতু এর কোনোটাই নেই তাই তারা হয়ে যায় অহঙ্কারী, অসৎ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বেশ কিছুদিন ধরেই জোর দিয়ে বললেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা। এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা হলো। প্রশংসাই হলো বেশি। কিন্তু আবার হঠাৎ করেই তিনি মত বদলে ফেললেন। পদক্ষেপ নিলেন নিজের ছাত্রদলকে সক্রিয় করার। মানুষ দেখলো এর পেছনে রয়েছে অন্য উদ্দেশ্য। ছাত্রদলকে সক্রিয় করা হয়েছে ছাত্রদের মঙ্গলের জন্যে নয়, ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংকটকালেই ছাত্রদল তার কিছুটা প্রমাণ দিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়েছে ছাত্রদল। খালেদা জিয়াকে বোঝানো হয়েছে, শুরু থেকে ছাত্রছাত্রীদের এভাবে পেটালে আন্দোলন করা সম্ভব হতো না। বিব্রতকর অবস্থায় ভিসিকে পদত্যাগ করতে বলতে হতো না সরকারকে। এর মধ্যে একেবারে সত্য যে নেই তা নয়। ছাত্রদলের নেতা-ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে সক্রিয় থাকলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আন্দোলন করা কঠিন হতো সন্দেহ নেই। তবে আন্দোলন যে হতো না, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। ভুলে গেলে চলবে না '৯৬ সালে ছাত্রদল সক্রিয় থাকা অবস্থাতেই পতন হয়েছিল বিএনপি সরকারের। অতীতের কোনো সরকারই ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে শান্ত করতে পারেনি। বরং যখন পেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, পেটানো হয়েছে তখনই ছাত্ররা বেশি অশান্ত হয়ে উঠেছে। বিএনপি এবং তার ছাত্র সংগঠন এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের ওপর স্বৈরাচার এরশাদ সরকারই

সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করেছে। কিন্তু এই সময়েই ছাত্রদল সবচেয়ে শক্তিশালি ছিলো। বিএনপি এবার ক্ষমতায় এসে সে কথাও ভুলে গেছে।

ক্ষমতায় আসার আগে খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা হবে। ক্ষমতায় এসে সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু, এক প্রতিমন্ত্রী পুত্রকে গ্রেপ্তারও করেছিলেন। সবার বিরুদ্ধেই অভিযোগ ছিলো সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির। সন্দেহ নেই গ্রেপ্তারগুলো আইওয়াশ ছিলো। কিন্তু তারপরও প্রশংসিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ তার ভিআইপি সন্ত্রাসী হাজারী, তাহের, শামীম ওসমান, হাজী সেলিমদের রাষ্ট্রীয়ভাবে শেল্টার দিয়েছে। বিএনপি পিন্টুদের গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু বিএনপি এই চরিত্র বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। লম্বা হাত পিন্টুদের মুক্ত করে দিয়েছে। বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে টোকাই সাগরদের। লম্বা হাতের প্রশ্রয়ে ছাত্রদল সভাপতি জাকির খান নারায়ণগঞ্জবাসীর আতঙ্ক হয়ে উঠতে বেশি সময় নেয়নি। অবশেষে গ্রেপ্তারের জন্যে অভিযান চালানো হলেও জাকির খান গ্রেপ্তার হয়নি বা করা হয়নি। তারপরও আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির একটু পার্থক্য আছে। আওয়ামী লীগ কখনো শামীম ওসমানকে গ্রেপ্তারের চেষ্টাই করেনি। বিএনপি জাকির খানকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অন্তত করেছে, সেটা আইওয়াশ হলেও। অন্তত জাকির খান যে সন্ত্রাসী সেটা স্বীকার করে নিয়ে নিয়েছে বিএনপি সরকার। সেই অর্থে বর্তমান সরকারের সময়ে ভিআইপি সন্ত্রাসীর সংখ্যা কমেছে। তবে অসংখ্য ছোট ছোট সন্ত্রাসী সরকারি দলের পরিচয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। সে কারণে কমছে না হত্যাকান্ড। উন্নতি হচ্ছে না আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। বিএনপির দলীয় কোন্দল আর সমন্বয়হীনতার সুযোগ নিয়ে সংগঠিত হচ্ছে জামায়াত। জামাতিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অবস্থান সংহত করছে পরিকল্পিতভাবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে জামায়াত হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ। এটা বিএনপি এবং বাংলাদেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর সেটা বুঝতে পারছে না ক্ষমতাসীন বিএনপি।

বিরোধী দলকে আন্দোলন করতে দেয়া যাবে না- পথটি আওয়ামী লীগ দেখিয়ে গেছে। সেই পথটি এখন বিএনপি অনুসরণ করছে। তবে আওয়ামী লীগের চেয়ে আরো অনেক কঠোরভাবে। বিএনপি সরকার কোনোভাবেই আওয়ামী লীগকে সংগঠিত হতে দিতে চাইছে না। এজন্য বেছে বেছে সক্রিয় নেতাকর্মীদের নামে মামলা দেয়া হচ্ছে। করা হচ্ছে গ্রেপ্তার। যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রকৃত সন্ত্রাসীর সংখ্যা খুবই কম। ছাত্রলীগে সুস্থধারার যে কয়েকজন নেতা রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম লিয়াকত সিকদার। তিনি এখন ছাত্রলীগের সভাপতি। লিয়াকত সিকদারসহ ছয়-সাতজনকে একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করলো সরকার। এর মধ্যে দু'একজনের নামে সন্ত্রাসের অভিযোগ যে ছিল না তা নয়। কিন্তু লিয়াকত সিকদারের নামে কখনোই কোনো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ ছিল না। ক্যাম্পাসে কারা সন্ত্রাসী, কাদের কাছে অস্ত্র আছে, কী অস্ত্র আছে- এটা যেমন ছাত্রছাত্রীরা জানে, সাংবাদিকরা জানে, জানে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাও। ছাত্রলীগে সন্ত্রাসী আছে, অস্ত্র আছে- এটা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু লিয়াকত সিকদার সন্ত্রাসী, তার কাছে অস্ত্র আছে– একথা কেউই বিশ্বাস করবে না। এমন কী এই অভিযোগ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরাও করতে পারবে না। তারপরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে লিয়াকত সিকদারকে। তার বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে সাতটি হত্যা মামলা। আবার ছাত্রলীগের অনেক সন্ত্রাসী এখনো অবস্থান করছেন প্রকাশ্যে। সরকারের লম্বা হাত আসলে সন্ত্রাসীদের ধরতে চায় না, হয়তো চায় না সন্ত্রাস কমাতেও। সন্ত্রাসকে পুঁজি করে রাজনীতি করতে চায়, সরকার চায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলবে এবং এর পুরো দায়ভার বিরোধী দলের ওপর চাপানো হবে। এই একই খেলা খেলতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ। পারেনি, সেটা তাদের জন্যে বুমেরাং হয়েছে। তারপরও বিএনপি সরকার আওয়ামী সরকারের দেখিয়ে যাওয়া ভুল পথেই চলছে। হয়তো এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

মিথ্যা মামলা দিয়ে লিয়াকত সিকদারকে আটকে রাখা যায়নি। একে একে জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা অসীম কুমার উকিল। তাকেও সরকার গ্রেপ্তার করলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিল বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাকে আটকে রাখা অবৈধ। এবং হাইকোর্ট এও বললো জেল গেট থেকে শ্যোন কেসে গ্রেপ্তার করা যাবে না। সাবেক আমলা মন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেয়া হচ্ছিল না। এই মামলায়ই আদালত মন্তব্য করেছে, 'সরকারের হাত অনেক লম্বা। তবে আদালতের হাতও অনেক প্রসারিত।'

বিগত আওয়ামী সরকারের সময়কালে আদালতের বিরুদ্ধে মন্ত্রীরা রাজপথে লাঠি মিছিল করেছেন। তখন বিএনপি বক্তব্য রেখেছে আদালতের পক্ষে। এখন একের পর এক সরকারের বিরুদ্ধে রায় আসছে আদালত থেকে। যা সরকারের জন্যে চরম বিব্রতকর। আদালত বিষয়ে বিএনপি সরকারের অবস্থান কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিও যদি লাঠি মিছিল বের করে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ আমাদের রাজনীতিবিদরা ততক্ষণ পর্যন্ত একটি বিষয়ের পক্ষে কথা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি তার অনুকূলে থাকে। প্রতিকূলে গেলেই সুর বদলে যায়।

জনগণের ভোট নেবেন আর তাদের কোনো কথা বলতে দেবেন না– এর নাম কী গণতন্ত্র? ভোট দিয়ে ভুল করেছি- জনগণকে এরকম ভাবতে বাধ্য করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মনে রাখতে হবে, জনগণ আগামী নির্বাচনে আপনাদের ভোট দিতে বাধ্য না। পুলিশ, বিডিআর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেটানো যাবে; শহীদ মিনার, ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রাখা যাবে- ভোট পাওয়া যাবে না

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। তাদের অনেকের নামে এখন দুর্নীতির মামলাও হচ্ছে। একইভাবে আওয়ামী লীগও বিএনপি মন্ত্রীদের নামে মামলা দিয়েছিল। যাদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তারা দুর্নীতি করেনি-

পচা ভারতীয় গম গুদামজাত করে দেশের অর্থ আত্মসাৎ করার শাস্তি কী ‘ক্ষুব্ধ’ এবং ‘ভর্ৎসনা’ শব্দ দু’টি? সত্যি এক আজব দেশে বাস করি আমরা। এই রাজনীতিবিদরা আমাদের সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি নির্মূলের বক্তৃতা শোনায়। বোকা জনগণ আবার সে কথা বিশ্বাস করে ভোটও দেয়

দেশের খুব কম সংখ্যক মানুষই এটা বিশ্বাস করবেন। তাহলে এদের নামে দুর্নীতির মামলা হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। শুধু মামলা নয়, বিচার হবে, শাস্তিও হবে। এমনটাই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে এমন হয় না। কারণ কী? কারণ দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না বা প্রমাণ করা হয় না। যারা মামলা দেয় এবং যাদের নামে মামলা হয় উভয়েই উভয়কে খুব ভালো মতো চেনে, জানে। দুর্নীতি শব্দটির সঙ্গে এদের সবারই সম্পৃক্ততা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ- দু’ভাবেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ হলেও কিছু যায় আসে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যায়।

দুর্নীতির মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েও মওদুদ আহমদ আইনমন্ত্রীর চেয়ারে বসার সুযোগ পান।

কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে দেশের ভাবমূর্তির অবস্থা কী হলো না হলো, সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কর্নেল আকবরের মন্ত্রিত্ব থাকাটাই সবচেয়ে বড় সত্য। মহীউদ্দীন খান আলমগীর, মোঃ নাসিম, কর্নেল আকবরদের লম্বা হাত ধরেই বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম স্থান অক্ষুণ্ন রাখবে। বাংলাদেশ পেয়ে যাবে হ্যাটট্রিক শিরোপা। নিশ্চয় জাতি হিসেবে এক বিরল সম্মানে ভূষিত হবো আমরা! এমন সম্মান অতীতে খুব বেশি দেশ পায়নি। এটাই হবে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরস্কার!

জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একটু বড় কোনো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে পছন্দ করেন। ইতিমধ্যে তিনি তার পছন্দের প্রমাণও দিয়েছেন। গঠন করেছেন বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের ওপর মানুষের কোনো আস্থা নেই। তারা অর্থের বিনিময়ে তদন্ত রিপোর্টে যা ইচ্ছে তাই করে। এটা ওপেন সিক্রেট বিষয়। এই কারণেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হলে মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে। যদিও তদন্ত কমিশনের সেই রিপোর্ট দেখার সুযোগ হয় না মানুষের। কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে রিপোর্ট লুকিয়ে রাখে সরকার। তারপরও মানুষের পক্ষে আসল ঘটনা জানা সম্ভব হয় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হলেই। বিগত সরকারের সময়ে দেশে অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। যার প্রতিটিতেই আসামি করা হয়েছিল বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের। অধিকাংশ সময়েই নিরপরাধ বিএনপি নেতাকর্মীদের জড়ানো হয়েছিল মামলায়। আসল আসামি খোঁজার চেষ্টা করা হয়নি, বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে। বাস্তব যুক্তি এবং ভিত্তি না থাকলেও নারায়ণগঞ্জ বোমা বিস্ফোরণ মামলায় আসামি করা হয়েছিল তৈমুর আলম খন্দকারসহ বিএনপি নেতাদের। শামীম ওসমান বাহিনীর দাপটে যদিও তখন তৈমুর আলম খন্দকারের নারায়ণগঞ্জে যাওয়ারই ক্ষমতা ছিল না। আরেকটি বোমা বিস্ফোরণ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল যশোরে উদীচীর মঞ্চে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে এই মামলাগুলো পুনরায় তদন্তের ব্যবস্থা করেছে। উদীচী হত্যাকান্ড মামলার চার্জশিট আগেই দেয়া হয়েছিল। বিএনপি সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল বারী সরকারকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। এবং বারী কমিটি রিপোর্টও দিয়েছে। এই বারী কমিটির রিপোর্টকে আরেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোলাম রাব্বানী অবৈধ বলেছেন। বিচারপতি গোলাম রাব্বানী বলেছেন, ‘একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসেবে আবদুল বারীর এই তদন্ত কমিশনের দায়িত্ব নেয়াই উচিত হয়নি। কারণ তিনি নিজেই জানেন যে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।’

এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের ওপর মানুষের যে আস্থা ছিল সেটারও অবসান হতে চলল। একটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজন হয় কিছু অবলম্বনের। শ্রদ্ধা করা যায়, সম্মান করা যায় এমন কিছু মানুষ থাকতে হয়। থাকতে হয় এমন কিছু প্রতিষ্ঠান। ‘সব কিছু নষ্টদের অধিকারে চলে যাওয়া’ সমাজেও মানুষ আশার বাণী শুনতে চায়। আমাদের সর্বোচ্চ আদালত এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষ বিশ্বাস করতে চায় সরকারের লম্বা হাতকেও শাসন করার ক্ষমতা রাখে আদালত। কিন্তু সেই আদালতের বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের কাজ নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তখন মানুষের বাঁচার অবলম্বন কী? বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর বক্তব্যকে সত্যি ধরে নিলে একটি বেআইনি কাজ করেছেন বিচারপতি আবদুল বারী। একজন বিচারপতির কাছে কী মানুষ এটা আশা করতে পারে? আর বিচারপতি যদি বেআইনি কাজ করেন তাহলে বেআইনই তো হয়ে যায় আইন। বিচারপতি যদি বেআইনি কাজ করতে পারেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আইন অমান্য করলে আর অপরাধ কোথায়?

বিচারপতিদের নামের সঙ্গে ইদানীং আরেকটি শব্দ যোগ হয়েছে ‘বিব্রত’। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে ‘বিব্রত’ শব্দটি আলোচনায় আসে। রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রীরা তাদের সুবিধামতো ‘বিব্রত’ শব্দটির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। যারা বিব্রত হচ্ছেন তাদের থেকে কোনো ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত দেয়া হয়নি। ফলে মানুষ ঠিক বুঝতে পারছে না এই ‘বিব্রত’ শব্দটির অর্থ কী?

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার কাজটি করতে হয়। কর্মকর্তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব দেয়া হয়। কোনো কর্মকর্তা যদি তার কাজটি ঠিকমতো করতে না পারেন তাহলে তার অযোগ্যতা প্রকাশ পায়। কাজটি করার সময়ে কোনো ক্ষেত্রে কর্মকর্তার বুঝতে অসুবিধা হলে ঊর্ধ্বতন বা সংশ্লিষ্ট কারো সহযোগিতা নিয়ে তিনি কাজটি করতে পারেন। কিন্তু তিনি কাজটি করতে পারবেন না, এমনটা কী বলতে পারেন? এটা করলে তো তার পক্ষে আর ঐ পদে থাকার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। ধরেই নেয়া যায় ঐ

পদে থাকার যোগ্যতা তার নেই।

বিচারপতিরা কেন 'বিব্রত' হচ্ছেন- এই প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার কী জনগণের আছে বা থাকা উচিত? এর ব্যাখ্যা বিচারপতিদের কাছ থেকেই আসা উচিত।

কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সাধারণত একটি কাজ করতে তখনই অপারগতা প্রকাশ করেন যখন তার প্রতি নানা রকম হুমকি থাকে। বিচারপতিদের 'বিব্রত' হওয়ার সঙ্গে সরকার বা অন্য কোনো পক্ষের হুমকির মতো বিষয় আছে কিনা সেটার পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া প্রয়োজন। সরকারের হুমকি থাকলেও সেটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ আদালত নিজেই বলেছে, সরকারের চেয়েও আদালতের হাত প্রসারিত।

সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা প্রক্রিয়াটি শেষ করতে চাইছে না নানা রকম ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা দিয়ে। বোঝাই যায় সরকার বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চায়। ঝুলিয়ে রাখা, সিদ্ধান্ত নিতে না পারা- এই সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান সরকারের প্রায় এক বছর সময়কালে 'ক্ষুব্ধ' নামক আরেকটি শব্দ বেশ আলোচনায় এসেছে। প্রায়ই পত্রিকার পাতায় দেখা যায় 'প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ'। কৃষকের কাছ থেকে গম কেনার কথা বলে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ তুলে নিয়েছে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা-এমপিরা। তারা কৃষকের থেকে গম না কিনে, গুদামজাত করেছে ভারতীয় পচা গম। সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। দোষী হিসেবে নাম এসেছে বেশ কয়েকজন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের। এরকমই একজন হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু। বগুড়া-৭ আসনের সংসদ সদস্য। আইন প্রণেতা। এই আইন প্রণেতা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। প্রতারণা করেছেন দেশের সঙ্গে। শুধু অর্থের লোভে পচা ভারতীয় গম গুদামজাত করেছেন। এরকম আইন প্রণেতাদের কাছে দেশ কতটা নিরাপদ? লালুর এই অনৈতিক প্রতারণামূলক কর্মের ঘটনায় নাকি প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ডেকে 'ভর্ৎসনা' করেছেন। এই 'ক্ষুব্ধ' এবং 'ভর্ৎসনা' শব্দের অর্থ কী?

পচা ভারতীয় গম গুদামজাত করে দেশের অর্থ আত্মসাৎ করার শাস্তি কী 'ক্ষুব্ধ' এবং 'ভর্ৎসনা' শব্দ দু'টি? সত্যি এক আজব দেশে বাস করি আমরা। এই রাজনীতিবিদরা আমাদের সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি নির্মূলের বক্তৃতা শোনায়। বোকা জনগণ আবার সে কথা বিশ্বাস করে ভোটও দেয়।

রাজনীতিবিদদের কথায় এবং কাজে মিল থাকে না, এটা প্রায় প্রমাণিত সত্য। কিন্তু বর্তমান সরকার সম্ভবত সর্বকালের রেকর্ড ভাঙার প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনেক রক্তপাতের পর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিরোধী দলে থেকে চুক্তির বিপক্ষে আন্দোলন করলেও ক্ষমতায় এসে বিএনপি চুক্তির বিপক্ষে আর কোনো কথা বলেনি। পাহাড়ি নেতা সন্তু লারমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিক বৈঠকও করেছেন। আলোচনায় সন্তু লারমাকে খালেদা জিয়া পার্বত্য অঞ্চলের নেতা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে সন্তু লারমাকে সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একবারও চুক্তি বাতিলের কথা বলেননি। বিদেশী দাতা সংস্থার সঙ্গে বৈঠকেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান বললেন, অবৈধ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই চুক্তি বাতিল করতে হবে। এটা বিএনপি সরকারের বক্তব্য, না ব্যক্তি নোমানের বক্তব্য? সরকারের বক্তব্য হলে সরকার কী এই চুক্তি বাতিলের দাবিতে ফিরে গেছে? সরকারের বক্তব্য না হলে একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে নোমান কী এমন বক্তব্য রাখতে পারেন? আসলে এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে সরকারের ভেতরে কোনো সমন্বয় নেই। সবাই চলছেন, কাজ করছেন নিজের জন্যে, দেশের জন্যে কেউ কাজ করেন না, ভাবেনও না। সেই সময় কারো নেই। যে যেভাবে পারছেন আয় করে নিচ্ছেন। জেট ফুয়েলের নামে আমদানি হচ্ছে কেরোসিন। এমন অনিয়ম প্রতারণা ধরা পড়ছে, শাস্তি হচ্ছে না। উল্টো পাচ্ছেন পুরস্কার। পুনরায় জেট ফুয়েল আমদানির অনুমতি। এক বছর পূর্ণ হতে যাওয়া জোট সরকারের সাফল্য উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছেই। জিনিসপত্রের দাম কমছে না। নিজের দলে কোন্দল বাড়ছে। বিদেশী দাতা সংস্থাদের সঙ্গে সম্পর্কের দিন দিন অবনতি ঘটছে। কোনো সেক্টরের ওপরেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারের একটিই সুবিধা, বিরোধী দল না থাকা। বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি ব্যর্থ। দেশে তাদের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। বিদেশে গিয়ে বলে দেশে মৌলবাদের উত্থান হয়েছে। জনগণ বর্তমান সরকারের কর্মকান্ডে বিরক্ত। বিরক্ত বিরোধী দলের আচরণেও। সরকার, বিরোধী দল কেউই তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। মানুষ আশা হারিয়ে ফেলছে রাজনীতিবিদদের ওপর থেকে। যা গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্যে রীতিমতো আশঙ্কার।

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের সামনে এখন চার বছর সময়। এই চার বছর সময়ে সরকার যদি তার হাত আরো লম্বাই করতে থাকে, তাহলে দেশের অবস্থা এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সত্যি সত্যি প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। বিএনপি সরকারের এখনও সময় আছে নিজেকে সংশোধন করার। চাইলে লম্বা হাত স্বাভাবিক করা অসম্ভব নয়। কিন্তু চাইতে হবে আন্তরিকভাবে। সমস্যাটা এখানেই। রাজনীতিবিদরা আন্তরিকভাবে শুধু নিজের জন্যেই চায়, দেশ বা জনগণের জন্যে নয়।

'বিব্রত' শব্দটির অর্থ কী? যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার কাজটি করতে হয়। কর্মকর্তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব দেয়া হয়। কোনো কর্মকর্তা যদি তার কাজটি ঠিকমতো করতে না পারেন তাহলে তার অযোগ্যতা প্রকাশ পায়

বাসা থেকে কাকের ডিম ফেলে নিজের ডিম নিরাপদে রেখে যায় কোকিল। কাক পরম যত্নে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে তোলে। বাচ্চা বড় হওয়ার পর কাক বুঝতে পারে এই বাচ্চা তার নয়, কোকিলের। তার শত্রুর। কোকিলের সেই বাচ্চা কাকের খোঁজও নেয় না কোনোদিন। পুরো বাংলাদেশটাই কাকের বাসা।